চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও উনবিংশ শতাব্দীর ভক্তি-গীতিকাব্য

চতুর্থ অধ্যায়

সংস্কৃত স্তোত্র সাহিত্য ও উনবিংশ শতাব্দীর ভক্তি গীতিকাব্য

[ক]

"প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মোটামুটি ধর্মাশ্রিত ও আধিদৈবিক এবং গান বাহিত ছিল। এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল দেবতার অনুগ্রহ - নিগ্রহ কাহিনীর মধ্য দিয়া সুরে তালে গল্প রসের যোগান দেওয়া এবং সনাতন পৌরাণিক গার্হস্থ্য ধর্মনিষ্ঠ জীবনের আদর্শ আবৃত্তি। এই গতানুগতিকতা খানিকটা ভঙ্গ হইল ষোড়শ শতাব্দে বৈষ্ণব গীতি-কবিতায় এবং চৈতন্যচরিত কাব্যে। এ কাব্যের বিষয় দেবদেবী নয়। সমসাময়িক এক মানুষ।" বলেছেন আচার্য সুকুমার সেন। [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ] অর্থাৎ দৈবী অনুগ্রহ - নিগ্রহ - নির্ভর সুদূর শূন্যোস্থিত কল্পভূমি থেকে মানব মহিমার বাস্তব ভূমিতে অবতরণ : —— মানুষের মধ্যেই বিশ্ব - রহস্যের সমগ্র শক্তির উজ্জীবন, উদ্বোধন ও আস্বাদন এবং জীবনের অভিব্যক্তি ও বিকাশ সম্ভব — এটাই পরিবর্তিত প্রগতি পথের একমাত্র আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা লাভ ও প্রতিষ্ঠাই হয়ে উঠেছিল, ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানবের একমাত্র লক্ষ্য। এর বীজ উপ্ত হয়েছিল মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভাবনায় ——

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাঁহার স্বরূপ।

আরো উচ্চকণ্ঠে ও স্পষ্ট ভাষায় উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল কথাটি সহজিয়া সাধকের উপলব্ধিতে —

শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

[খ]

নানা ঘটনা - দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ছুটে চলে জগৎ ও জীবন প্রবাহ — তার খানিকটা ছন্দিত প্রতিবিম্ব পড়ে সাহিত্যে। সমাজের তথা রাষ্ট্রের যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে চলে মানুষ যুগে যুগে — তার ভাব - ভাবনার স্বাক্ষরগুলি বহন করে

সাহিত্য। মুসলিম আধিপত্যের অবসানে ও ইংরাজ রাজশক্তির সমুত্থানের মধ্যে ঊনবিংশ শতকে আধুনিক যুগের শুভ যাত্রা সুরু হল। পত্তন হল ইংরাজী শিক্ষার। কোম্পানীর প্রবর্তনায় প্রতিষ্ঠিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একদিকে, অপর দিকে মিশনারী পাদ্রীরা গড়ে তুললেন শ্রীরামপুর মিশন। স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, প্রসার হল স্ত্রী শিক্ষার। হিন্দুদের নানা সামাজিক ব্যাধির যুক্তিসম্মত নিরাময়ের প্রয়াস হল— সতীদাহ প্রথা হল অসিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। সিদ্ধ হল বিধবা বিবাহ। নব জাগরণের চিন্তার মুক্তি ও তার কর্মরূপ দিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। পদ্য রীতির স্থলে গড়ে উঠল বাংলা গদ্যরীতি। প্রতিষ্ঠিত হল মুদ্রন যন্ত্র, স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণাদির-ও প্রকাশনা সুরু হল এবং অনুরূপ ধারায় গড়ে উঠল গদ্য সাহিত্য। খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজা রামমোহন বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সংবাদপত্রের প্রকাশনায় — গদ্যের অগ্রগতি হ'ল দ্রুত ও দৃঢ়পদক্ষেপে। মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী নেতৃবর্গ-ও সমান তালে সংবাদ-পত্রাদি প্রকাশ করতে লাগলেন আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ইংরাজের নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা ও সেই ধারায় বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রয়াস। অবশ্য এই ধারাটি সুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই। রুশ দেশীয় প্রতিভা হেরাসিম লেবেডেফ বেঙ্গলী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে নাটক মঞ্চস্থ করেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। অনেক সখের নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠেছিল বাঙলা ধনী-বণিক ও জমিদারদের আগ্রহে। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বেলগাছিয়া নাট্যশালা। কারণ এই সূত্রেই মাইকেল মধুসূদন বাংলা রচনায় আগ্রহী হন এবং এখানেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটক মঞ্চস্থ হয়।

[গ]

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে মানুষের সমাজে এবং কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে-ও, যে সব পরিবর্তন ও নবীকরণ হয়, তা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়,

কোন অমূল তরু-ও নয়। একটা ধারাবাহিকতা থাকেই এবং নতুন বাঁক নেবার মুখে — পুরাণো ও নতুনের মধ্যে প্রথমটা একটা সংঘর্ষ ও পরে সমন্বয় সাধিত হয়। পুরাণো ও নতুন দুটি ধারার সংঘর্ষের সময়ে পুরাণো ধারার মধ্যে যে সারবস্তু থাকে — তা নতুন ধারার মধ্যে সমর্পিত হয়ে — কখনো নতুন সাজে ও নামে বেঁচে থাকে, আর অসার অংশ — আপনি শুকিয়ে ঝরে পড়ে শুকনো মুকুলের মতো।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য — মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্য এই তিন ধারায় বহমান ছিল। তবে সবগুলির আকার প্রকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য এক রকম ছিল না। বৈষ্ণব সাহিত্য — পদাবলী ও চৈতন্যোত্তর চরিত শাখা প্রবলতর ছিল। বিশেষত: বৈষ্ণব পদাবলী নিত্যতোয়া গঙ্গা ধারার মতো বেগে ও বৈচিত্র্যে কালাতিশায়ী। ঊনবিংশ শতক তো বটেই এই বিংশ শতকের অন্ত্য দশকে-ও বৈষ্ণব পদাবলী সাধন সঙ্গীত হিসাবে অর্থাৎ ভক্তি সাহিত্যের মুখ্য আধার রূপে সগৌরবে সুস্থিত।

মঙ্গলকাব্যের খাতে পুরাণো ধারা ক্রমে প্রক্ষীণ হয়ে পড়েছিল — নতুন নতুন উৎস থেকে খানিকটা জলের যোগান এসে কোন রকমে তির তির করে চলতো। গঙ্গা ভাগীরথীর বা ব্রহ্মপুত্র থেকে প্রবল জলরাশি যেমন সমুদ্র সান্নিকটে — সুন্দর বনের কাছাকাছি এসে বহু ছোট ছোট খাড়িতে ভাগ হয়ে সমুদ্রে পড়ে — তেমনি বড় শাখাগুলি ভেঙে নানা প্রকীর্ণ ধারার মঙ্গল কাব্যে পরিণত হয়েছিল অর্থাৎ চণ্ডী-মনসা-ধর্ম দেবতাকে ছেড়ে মুখ্যত: ছোট ছোট দেবদেবী — কমলা - ষষ্ঠী - শীতলা সারদা (সরস্বতী), গঙ্গা, সূর্য প্রমুখ দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করে — কমলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, সারদা মঙ্গল, গঙ্গা মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গোঁসানী মঙ্গল, ব্যাঘ্রদেবতা বায়ুমঙ্গলাদি — নানা ধারায় বাহিত হয়েছিল। লোককথার মিশ্রণে নানা ব্রতকথাদির সঙ্গে সংযুক্তি ছিল তার। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-ই শেষ সার্থক রচনা। অবশ্য উনিশ শতকে-ও কিছু কিছু মঙ্গল কাব্য রচনার সন্ধান পাওয়া যায় — যেমন জগন্ময় মিত্রের মনসা মঙ্গল (১৮৪৪), দ্বিজ কালীপ্রসন্নের মনসামঙ্গল (১৮৬০) দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত গঙ্গা ভক্তি তরঙ্গিনী (১৮২৩) ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বিষয় যাই হোক — বাঙালীরা — বাঙালী কবি সমাজ 'মঙ্গল' কথাটি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থনামে ও কাব্যনামেতে 'মঙ্গল' শব্দটি বার বার উচ্চারণ করেছেন কারণ এই শতকের-ও যেমন সারদামঙ্গল, বর্ষামঙ্গল, ঋতুমঙ্গল নাম সুলভ।

অনুবাদ শাখার ইতিহাস অনুরূপ। সাহিত্য সৃষ্টিতে পদ্য রীতি থেকে গদ্য রীতির প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদে উত্তরকালে এই গদ্যানুবাদ পদ্ধতিটি জনপ্রিয় হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের গদ্যানুবাদে হস্তক্ষেপ করেন এবং পরে বর্দ্ধমান রাজসভা থেকে মহাভারতে অনুবাদ হয়েছে। বিংশ শতকে-ও এই ধারাটি জনপ্রিয় হয়েছিল — হেমচন্দ্রের রামায়ণ এবং রাজশেখর বসু রচিত রামায়ণ ও মহাভারত উল্লেখযোগ্য। পদ্যে রামায়ণ রচনা করে ছিলেন পিতা পুত্র — জগৎ রাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯২ আর রঘুনন্দন গোস্বামী রাম রসায়ণ (১৮৩৩) রচনা করেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা এই যে পদ্য রীতিতে-ই রাজকৃষ্ণ রায় — সপ্তকান্ড রামায়ণ (১৮৭৭ - ৮৫) ও মহাভারত (১৮৮৬ - ৯৩) অনুবাদ করেছিলেন।

[ঘ]

ইতিহাসের ধারাটি অনুসরণ করা যাক। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই — বস্তুত: ইংরেজ শাসনের পত্তন হল। এটির নাম কোম্পানীর অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আমল। কোম্পানীর আমল শেষ হয় এক শত বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে। মহারাণীর ঘোষণাতে ভারত সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর ক্রমশ: ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার পরিচয় পূর্বে আলোচ্য অধ্যায়ে [খ] অংশে সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়েছে।

কিন্তু তার সমান্তরালে — কলিকাতার নব্য ইংরাজী শিল্প - সংস্কৃতির উজ্জ্বল আলোকের পশ্চাতে যে আর একটি প্রাণবান পুরোণো ধারা স্বল্পালোকিত অঞ্চলে

নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান ও বহমান ছিল — বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার স্থান ও দান বিশেষতঃ বিবর্তন ও বিকাশের মুখে নিতান্ত নগণ্য ছিল না। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম খ্যাতিমান ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ ও ভাষায় তার বিবরণ দেওয়া যাক।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতায় ইংরেজ শাসন শুরু হয়েছে, মধ্যযুগীয় গ্রামীণ জীবন ক্রমে ক্রমে নাগরিকতার লোভ লোলুপতায় আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের নিস্তরঙ্গ পরিবেশ ছেড়ে কলিতীর্থ কলকাতায় হাজির হন। তখন-ও গ্রাম - গ্রামান্তরে আখড়ায় আখড়ায় কীর্তনের পালাগানের মিলন - অভিসার - মাথুর - ভাব সম্মেলনের পদের হাজারবার আবৃত্তি চলেছে বাউলেরা একতারা বাজিয়ে পায়ে ঘুঙুরের চঞ্চল বোল তুলে বাঁয়াতে ঘা মেরে পরমগুরু সাঁইর কাছে আর্তি জানাচ্ছে, সহজিয়া বৈষ্ণব আউলিয়া সাঁইপন্থী কর্তাভজারা রহস্যময় প্রতীকী গানে দেহকে মন্থন করে বৈদেহী রসানন্দে মশগুল হয়ে আছে। * * নব যুগাদর্শ অভিনবত্বের ঘন্টাধ্বনি আরম্ভ করলে-ও পুরাতন ভাবাদর্শে লালিত কবি ও শ্রোতারদল তখন-ও তার তাৎপর্য ধরতে পারেনি। তখন কলকাতাকে ঘিরে কবিগান, আখড়াই, টপ্পা মালসী (ভবানী বিষয়ক) প্রভৃতি সঙ্গীতাশ্রয়ী কাব্য কবিতা জনচিত্ত রঞ্জনে ব্যাস্ত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই ধরণের সঙ্গীত কলা সাধারণ - অসাধারণ সমস্ত স্তরের বাঙালীকেই মাতিয়ে তুলেছিল।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড প্রথম অধ্যায়, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

[৩]

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধ থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত — এক শত বৎসর কাল ছিল বাঙালীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অনিশ্চয়তার যুগ। এই সময়ে রাজ্য শাসন নীতিও ছিল শিথিল ও সংশয়াকুল। বণিক বৃত্তি ও রাজ্য শাসন — এই দুই বিপরীত মনোভাবের দ্বারা শাসক শ্রেণীর কর্মপদ্ধতি ছিল অনেকটা দ্বিধা গ্রস্ত। সাহিত্য ক্ষেত্রে-ও এই দ্বিমুখিতার প্রভাব পড়েছিল।

"ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল হইতে গুপ্ত কবির মৃত্যু কাল পর্যন্ত শত বৎসর কালকে বাংলা

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাত্রিকাল বলিয়া অভিহিত করা যায় ; যদিও ইহার দ্বিতীয়ার্ধে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের উৎসাহ, বাংলা গদ্য প্রচেষ্টা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা উদয় দিগ্‌বলয়ে নূতন দিনের পূর্বাভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। * * *

এই শত বৎসরের রাত্রির স্তিমিতালোকের মধ্যে ছোট বড় বিভিন্ন নক্ষত্র পুঞ্জের ক্ষীণ জ্যোতি লইয়া বাঙ্গালা জন-সাহিত্য গগনে যাহারা ভিড় জমাইয়া ছিল, বর্তমান দিনের প্রখরালোকে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেলেও সে রাত্রিতে তাহাদের দাম ও দান কম ছিল না। কবি, কীর্তন, ঢপ, পাঁচালী, যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, টপ্পা প্রভৃতির বিপুল ও বিচিত্র আয়োজনে সমসাময়িক বাঙ্গালী জনসমাজের মনের ক্ষুধা ও রসের তৃষ্ণা পরিপূর্ণ ভাবেই **হয়তো** মিটিয়া ছিল। তারপর নূতন আশা - আকাঙ্ক্ষা ও জীবন ভঙ্গী লইয়া যখন নবযুগের আবির্ভাব হইল, তখন সূর্যোদয়ে নক্ষত্র পুঞ্জের মতো অকস্মাৎ তাহারা যেন দিগন্তে মিলাইয়া গেল।" [দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী — ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী]

যাহোক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাত্র ও রসিক সমালোচক উভয়ের কাছেই এই যুগটির একটি বিশেষ মূল্য বহন করে। উনবিংশ শতকের ইংরাজী শিক্ষা ও নব যুগের অভ্যুদয়ে — এই যুগটি অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত যুগটি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। একটি ধারাকে বলা যায় ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্য — অপরটি ইংরাজী প্রভাবপুষ্ট বাংলা সাহিত্য। ক্ষয়িষ্ণু পুরাণো ধারা ও উদীয়মান নতুন সাহিত্যের অসম প্রতিযোগিতার ফল সুবিদিত ও সুনিশ্চিত। ইংরাজী প্রভাব বর্জিত ধারাটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল। এই লুপ্ত হওয়া কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়া নয়। নবীন ধারার মধ্যে আধুনিক যুগ প্রবাহের মধ্যে আত্ম উৎসর্জন। ভক্তি **ভাগীরথীর** নিত্য তোয়া ধারার মতো বৈষ্ণব পদাবলীর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু ভক্তিভাব বাহী অন্যান্য প্রস্রবণগুলি কবি, পাঁচালী, আখড়াই, যাত্রা ঢপ এইগুলিও নতুন ভাবে, রঙ্গমঞ্চের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ও যাত্রাগানের আসরে নব নব রূপে উনবিংশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে তো বটেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও অনেকখানি অর্থবহ ছিল। সে কথা যথাস্থানে — আলোচিত হবে। এখন কবি-পাঁচালী ইত্যাদি ইংরাজী প্রভাব বর্জিত

ধারাটির উদ্ভব, বিকাশে পরিচয় দেওয়া যাক, — যেটিকে – ভারত চন্দ্রের মৃত্যু কাল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু কাল পর্যন্ত মোটামুটি শত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের রাত্রিকালের সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে।

[চ]

এই সময়কার ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্যের মুখ্য, তথা একমাত্র আধার ও আশ্রয় ছিল সঙ্গীত। এই জন্য কেউ কেউ এই কালকে গানের যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। যেমন রসভাণ্ডার গ্রন্থের ভূমিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — "বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগ লইয়া এমন একটা সময় গিয়াছে যাহাকে গানের যুগ বলা যাইতে পারে। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথকের আদিরসাত্মক সঙ্গীত, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির কবির গান, দাশরথি রায়ের পাঁচালী — এই সময়ে রচিত হয়।"

এই গীতি - প্রধান বা গীত সর্বস্ব ধারার নেতৃত্বে ছিল কবিওয়ালারা তাই অনেকে এই যুগকে কবিওয়ালাদের যুগ বলেও অভিহিত করেছেন। ডঃ সুশীল কুমার দে Bengali Literature in the 19th Century – গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "The interregumn till the emergence of the new literature was broken chiefly if not wholely by the KaviWallas."

জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষণাতে এই জনসাহিত্য ধারার – মুখ্যত কবিগানের প্রসার ঘটেছিল। তৎকালের মুখ্য নগরসমূহ — কাসিম বাজার, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া হয়ে গঙ্গার ধারাপথে হুগলী, চুঁচুড়া প্রমুখ স্থান হয়ে অগ্রসর হয়ে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ইংরেজের নতুন গড়া শহর কলকাতায়। লোকসাহিত্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটু সুন্দর মন্তব্য করেছেন ——" ইংরাজের নূতন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন

রাজসভা ছিল না, পুরাতণ আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি এবং হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"

যাহোক — এই শত বৎসরের ইংরাজী প্রভাব বর্জিত জনসাহিত্য শাখার মুখ্য প্রতিনিধিত্ব করেছে — কবিগান আখড়াই ও পাঁচালী এই তিনটি ধারা। এদের ইতিবৃত্ত ও পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

[ছ]

কবিগান কখন কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়েছিল। কবি গান নাম হ'ল কেন, কারা প্রাচীন ও প্রধান কবি এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। গুপ্ত কবি থেকে শুরু করে বহু পন্ডিত, গবেষক, সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ আলোচনা করেছেন। কাজেই এখানে পুন আলোচনা অনাবশ্যক। ডঃ সুশীল কুমার দে মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সূচক মন্তব্যটি উল্লেখ করে কবিগানের অন্যান্য পরিচয় বিশেষ করে ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত গানগুলির বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব আলোচনা করা যাক।

কবিগানের উদ্ভব ও বিকাশের কাল সম্বন্ধে অধ্যাপক ডঃ দে History of the Bengali Literature in the 19th Century গ্রন্থে লিখেছেন —
"The existence of Kavi songs may be traced to the beginning of the 18th Century or even beyond it to the 17th, but most flourishing period of the Kaviwallas was between 1760 and 1830."

কবি গানের মুখ্য অঙ্গ চারটি। প্রথম এই প্রকার — দেবী বিষয়ক গান, সখী সংবাদ, বিরহ, খেউর-লহর চাপান — কাটান পদ্ধতিতে কবির লড়াই হতো। প্রথম তিনটি অংশ বাঁধা পদ্ধতি ছিল গান রচনায় — চিতেন, পরেন, পরচিতেন, ফুকা,

মেলতা, মহরা — এই ভাবে। দেবীবিষয়ক গান -- মালসী শরৎ কালে এর বিষয় হতো আগমণী বা সপ্তমী এবং নবমী বা বিজয়া। সখী সংবাদ কৃষ্ণ বিষয়ক গান। এই দুটি ভক্তি সাহিত্যের অঙ্গ। বিরহ — নরনারীর প্রেম বিরহের কথা। আর চতুর্থটি অতি স্থূল — অশ্লীল গালাগাল। কবিওয়ালার সংখ্যা অনেক। সংবাদ প্রভাকর থেকে শুরু করে বহু গ্রন্থ — যেমন কবিওয়ালাদের গীত সংগ্রহ, প্রাচীন কবি সংগ্রহ, গুপ্ত রত্নোদ্ধার, প্রাচীন ওস্তাদি কবিগম, বাঙালীর গান, রসগুম্ফাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ — বহু গান সংকলিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদের মধ্যে — গোঁদলা গুঁই, রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, কেষ্টা মুচি, লালু নন্দলাল, ঠাকুর দাস চক্রবর্তী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, এন্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলাময়রা, ভবাণী বেনে নবাই ঠাকুর, যজ্ঞেশ্বরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বর গুপ্ত-ও নিজেও একজন কবিওয়ালা ছিলেন।

এই লড়াকু কবির গানের সাধারণ নাম ছিল দাড়া কবি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করার জন্য নয়, একটি বিশেষ দাঁড়া বা পদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড) অনুসারে করার জন্য। হার জিতের বিচার-ও হোতো বিষয়ের সঙ্গে সুর তাল ইত্যাদি মিলিয়ে।

ভবাণী বিষয়ক (বা গুরুদেবের গান) এবং সখী সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গান — এই দুটি শাখা ভক্তি রসাশ্রিত। গানগুলি-ও মুখ্যতঃ ভবাণী বিষয়ক গান মাত্রে-ই স্তোত্র ধর্মী। সখী সংবাদের — মধ্যে-ও বহু গানে আর্তি ও আবেদন — অকৃত্রিম ও নিবিড়।

দেবী বিষয়ক গীতের দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক ——

(ক) পথের সম্বল ছিল যাদের তারা ওগো তারা মা।
তারা পায় ছানা সব অনায়াসে।
আছি আমি পারে বসে
অপার সিন্ধু ভেবে।

তারা ভাবছি রূপ ভবের কূপে
ডাকছি দুর্গা দুর্গা বলে
দুর্গা তোমার দয়া হলে,
পার হয়ে যাই ভবে ।। (হরু ঠাকুর)

(খ) জয়া যোগেন্দ্র জায়া, মহামায়া
মহিমা অসীম তোমার ।
একবার দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে মা তোমায়
তুমি কর তার ভব সিন্ধু পার ।
মা, তাই শুনে এ ভবের কূলে
ডাকি দুর্গা দুর্গা বলে, বিপদ কালে
ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা ।
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া করলে না মা,
পাষাণে প্রাণ - বাঁধলি উমা
মায়ের ধর্ম এই কি মা ?
অতি কুমতি কুপুত্র বলে
আপনি-ও কুমাতা হলে, আমার কপালে
তোমার জন্ম যেমন পাষাণকুলে, ধর্ম তেমনি রেখেছ
দয়াময়ি, আজ আমায় দয়া করবে কি মা
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ । (এন্টনি ফিরিঙ্গি)

এ সম্বন্ধে – ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ——
"শুধু পড়ে গেলেই এই ছন্দ হারা ছন্নছাড়া পরিপাট্য হীন পংক্তিগুলি নিরাভরণ অনলংকৃত রূপেই শ্রোতার মনে সায়াহ্নের উদাসীন বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলে । এর মধ্যে তত্ত্বের চেয়ে বেদনা মিশ্রিত রয়েছে যে এর মধ্যে সাধক ও শ্রোতা যেন নিজেরই আবেগের প্রতিধ্বনি শুনতে পায় ।"[১৭] (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খণ্ড ।)

কবিগানের সখী সংবাদের মূল বিষয় কৃষ্ণের মথুরা গমনের পরে সখীরা দৌত্য। খুব রসাল - বিদ্রূপ ব্যঙ্গোক্তির সঙ্গে রাধার সখীর কৃষ্ণের প্রতি ভর্ৎসনা এবং তা নিয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর। এই ঝাঁঝালো বক্র অভিযোগ - অনুযোগের মধ্যে — কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তির আর্তিও ফুটে ওঠে। স্মরণ যোগ্য যে শীর্ষক সখী সংবাদ হলেও আসলে গোপী বৃন্দাবন লীলাই — এই অংশে গীত হয়।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক কবিয়াল রাম বসুর গীত থেকে।

(ক) ওহে এ কালো উজ্জ্বল বরণ তুমি কোথা পেলে,
বিরলে বিধি কি নির্মিলে ॥

যে বলেছে বলুক কালো
আমার নয়নে লেগেছে ভালো
বামা হলে শ্যামা বলতাম তোমায়
পূজিতাম জবা বিল্বদলে।

আরো তো আছে হে অনেক কালো
এ কালো নহে তেমন
জগতের মনরঞ্জন।

না মেনে গোকুলে কুলের বাধা
সাধে কি শরণ লয়েছে রাধা,
জনমের মতো ঐ কালো চরণে
বিকায়েছে বিনি মূলে ॥

ওহে শ্যাম, কালো শব্দে কহে কুৎসিত
আমার এই তো জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালোত্ব গেল হে কৃষ্ণ
তোমারে হেরে কালো
এখন বুঝিলাম কালোরো ধাড়া

সুন্দর নাহিক আর ।
কালো রূপ জগতের সার ।
ত্রিলোকে এমন আর নাহিক হেরি
ও রূপের তুলনা কি দিব হরি ।
কালো রূপে আলো করেছে সদা
মোহিত হয়েছে সকলে ॥
এক কালো জানি কোকিল
আর ভ্রমরার কালো বরণ ।
আর কালো আছে জলকালিন্দীর
কালো তো তমাল বন ।
আর কালো দেখ নবীন নীরদ
ছিল হে দৃষ্টান্ত স্থল কালো তো নীলকমল
সে কালোর কালোত্ব দেখেছে সবে ।
প্রেমোদয়, অশ্রু হয় করে বা ভেবে ।
তোমার মতন চিকন কালো
না দেখি ভুবন মন্ডলে ॥ (বাঙালীর গান)

কবি সঙ্গীতের অপর দুই অঙ্গ বিরহ ও খেউড় — ভক্তি সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্রবহীন ।

[জ]

আখড়াই গান —— বৈঠকী গান রাজা নবকৃষ্ণের রাজ সভায় এই গীতের এত রূপ দান করেন কুলুই চন্দ্র সেন ও নিধুবাবু । আচার্য সুকুমার সেন লিখেছেন — "আখড়াই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বন্ধ । তিনটি মাত্র গানে পালা শেষ হইত । প্রথমে মালসী অর্থাৎ দেবী বিষয়ক, তাহার পর প্রণয় গীতি, (সাধারণত: মিলনের আর্তি-সূচক), শেষে প্রভাতী (রজনী প্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ) ।

ইহাতে ধ্রুবপদ - খেয়ালের মতো রাগের আলাপ ও সুরের বৈচিত্র্য দীর্ঘ বিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেই জন্যই। বাজনা ও সঙ্গীতের বিশেষ পরিপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার দ্রুততা (tempo) ছিল প্রধানত চারি প্রকার : পিঁড়ে বা পিঁড়ে বন্দী, (overture), দোলন (swing) সব দৌড় (Full tempo) এবং মোড় (climax)। কবি গানের মতো আখড়াই গাওনার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে উত্তর - প্রত্যুত্তর হইত না। যে দল গান বাজনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইত তাহার-ই জয়।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড ২ সং - ড: সুকুমার সেন)

আখড়াই গানের প্রথম অংশটি মাত্র ভক্তি সাহিত্য ও সঙ্গীতের অন্তর্গত। কাজেই দেবী বিষয় গানের একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

(ক) সুর — বাগেশ্রী

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি সদাশিবে শুভ করি
নিরানন্দে আনন্দ দায়িনী ॥ ১
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞান বোধে সাকারা
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্য রূপিণী ॥ ২
প্রণতে প্রসন্নাভাব ভীমতর ভবার্ণব
ভয়ে ভীত ভবামি ভবাণী ॥ ৩
কৃপাবলোকন করি তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহ গো তারিণী ॥ ৪
(রাম নিধি গুপ্ত)

আখড়াই গান জনপ্রিয় ছিল না। কবি গানের দাপটে তা আর-ও নিষ্প্রভ হয়। তখন নিধুবাবুর শিষ্য মোহন চাঁদ বসু কবি গানের কিছু অংশ মুখ্যত: সখীসংবাদ যোগ করে নতুন রূপ দিলেন। এর নাম হাফ আখড়াই। "হাফ - আখড়াইর গানের সুরের ও রাগের পারিপাট্য কম ছিল। ইহাতে হালকা তাল ব্যবহার হইত ; আর যন্ত্রের ব্যবহার কম ছিল। আখড়াই-এ প্রায় বিশ বাইশ রকম যন্ত্র বাজান

হইত। হাফ আখড়াইয়ে উত্তর প্রত্যুত্তর বাদ প্রতিবাদ কখনো থাকিত তবে কবি গানের মত নয়।" (বাংলা সাহিত্যের কথা — ৪র্থ সং, ডঃ সুকুমার সেন)

(ঝ)

"বৈষ্ণব তত্ত্ব নিবন্ধের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রচনা মাত্রেই হয় পদ নয় পাঁচালী। পদ হইতেছে গান, একটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ রচনা। ইহা অসংলগ্ন একটি মাত্র গান হইতে পারে অথবা ধারা বাহিক গানের সমষ্টি হইতে পারে। আর পাঁচালী হইতেছে ধারাবাহিক আখ্যায়িকা কাব্য। যাহা আসর ফাঁদিয়া গাওয়া হইত একাধিক দিবস ধরিয়া। রামায়ণ মহাভারত, মনসা মঙ্গল, চন্ডী মঙ্গল ইত্যাদি সবই পাঁচালী। এমন কি আলাওলের পদ্মাবতী এবং ভারত চন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল পর্যন্ত।" — বলেছেন আচার্য ডঃ সুকুমার সেন (পাঁচালীর উৎপত্তি প্রবন্ধ, ডঃ সুকুমার সেন প্রাচ্যবানী প্রবন্ধাবলী, ২য় খন্ড)

ধারাবাহিক আখ্যায়িকা কাব্যের সাধারণ নাম পাঁচালী। পদ্যে রচিত আবৃত্তি, গান সহ ইহার প্রয়োগ হতো আসরে। রামায়ণ - মহাভারত, মনসা - চন্ডী ধর্ম ঠাকুর, মহাপ্রভুর মতো দেব-মানব, আবার দেবমহিমা নিরপেক্ষ লোর চন্দ্রাণীর প্রেম কাহিনী — সবই পাঁচালীর বিষয়। এটা ছিল সাধারণ ধারা। যেমন পদ বা পদাবলীর সাধারণ ধারা — গান, গীত সর্বস্বতা । মাঝে মাঝে — গদ্যে টীকা ভাষ্য।

উন বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা জন সাহিত্যের বিশেষ করে ভক্তি গীতি সাহিত্যের যে রূপ - বৈচিত্র্য ছিল, তার একটি সামগ্রিক চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন কবি জয় নারায়ণ ঘোষাল, তাঁর শ্রী করুণা নিধান বিলাস (১৮১৪ - ১৫) গ্রন্থে। কিছুটা উল্লেখ করা যাক ——

সংকীর্ত্ত নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দর
গড়া হাটি রাণি হাটি বিরহ মাথুর।
অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
কবি পশতো তাল ফেরা শুনিতে মধুর॥

পাঁচালীতে অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর
কতকথা (কথকতা) তরজাতে গারিতে প্রচুর।
ভবাণী ভবের গান মালসী মায়ার
গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিণী বিজয়াতে ভোর ॥
বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর
গোবিন্দ মঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।
চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর
শ্রবণে যাহার গান ভক্ত আতুর
কালিয়াদমন রূপ চন্ডী যাত্রা ধীর
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে পরিপূর।
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের নহর
বাঙ্গালায় নব গান নূতন ঝুমুর ॥

এখানে যে পাঁচালী গাথার পরিচয় দিয়েছেন কবি জয় নারায়ণ ঘোষাল তা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকের। পরে পাঁচালী গান ও গাহনা রীতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে উনিশ শতকের তিনের দশকের মাঝামাঝি। দাশরথি রায় — ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচালীর আখড়া স্থাপন করে নতুন পদ্ধতিতে রচনা ও গাহনা সুরু করেন। উত্তরকালে পাঁচালী বলতে — দাশরথির নতুন পদ্ধতির পাঁচালীকে-ই বোঝাত।

স্বভাব কবি দাশরথি রায় প্রথম জীবনে কবির দলে ছিলেন। অক্ষয়া বায়তিনী বা অকাবাই নামে এক মহিলার কবির দলের তিনি ছিলেন — উত্তর প্রত্যুত্তর বচসা-ও ছড়া কাটার প্রধান। কবির লড়াইতে এক আসরে তাঁর প্রতিপক্ষে নিধিরাম শুঁড়ি দাশরথির জাতি বর্ণাদি তুলে কটু গালাগাল করে। তাতে দাশুর আত্মীয় স্বজন — সকলে ঘোর অপমানিত বোধ করে দাশুকে কবির দল ত্যাগ করতে বলেন এবং দাশু কবির দল ত্যাগ করে পাঁচালীর দল গঠন করেন। কবির ছড়া অংশ যোগ করে — রচনা ও গাহনাতে অভিনবত্ব সৃষ্টি করে দাশরথি অল্পকালেই — নাম খ্যাতি অর্থ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বাইশ বৎসরের পাঁচালীকারের জীবনে কলিকাতা ছাড়া-ও মেদিনীপুর, বর্ধমান,

হুগলী - নবদ্বীপ , মুর্শিদাবাদ সহ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে এবং ঢাকা যশোহর ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল মালদহ সহ সমগ্র পূর্ব বঙ্গে নিজের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য রক্ষা করেছিলেন । প্রায় ৬৭।৬৮ টি পালা ও অনেক ছুট গান রচনা করেছিলেন দাশরথি । পুস্তকাকারে পাঁচালী সাহিত্যের প্রচার ও প্রকাশের অগ্রদূত -ও ছিলেন দাশরথি । প্রথমে বটতলা থেকে দশ খন্ডে পাঁচালী প্রকাশ করেন । তারপর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয় । মাঝখানে বঙ্গবাসী প্রকাশন থেকে হরি মোহনের সম্পাদনায় । শেষে — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড: হরিপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সমগ্র পাঁচালী প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্করণের ভূমিকাতে সম্পাদক যে মন্তব্যটি করেছেন — এক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা যায় ।

"দাশরথির সমগ্র পাঁচালীর পটভূমি ভক্তিরস । এই পটভূমিটি নানা রসের ধারায় অভিসিক্ত হইলেও ইহার প্রধান ধারা দুইটি হইতেছে করুণ - বিপ্রলম্ভ ও হাস্য রস । পাঁচালীর আকাশ অশ্রু হাস্যের মেঘরৌদ্রে বিচিত্র । তদুপরি পাঁচালী অন্যান্য জন সাহিত্যের মত প্রচার - প্রধান সাহিত্যে শুধু আনন্দ পরিবেশন নহে লোক শিক্ষাই ছিল পাঁচালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ।" (দাশরথি রায়ের পাঁচালী — শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

মানুষ সামাজিক জীব । কাজেই তার চিন্তা ভাবনা , ক্রিয়া - কর্মের মধ্যে সমকালের একটা বিশেষ স্থান থাকেই তবে মধ্য যুগের ও যুগসন্ধির কালের অধিকাংশ সাহিত্যিক রচনায় তার প্রকাশ গৌণ ও প্রচ্ছন্ন । অনুবাদ সাহিত্য -ও মঙ্গল সাহিত্যের মধ্যে এই প্রভাব — সমাজ সচেতনতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি । কবির গানে ছড়ার অংশে তার একটা মূলদিক আছে — যেটা পরে সং মুখো এবং প্রহসন ব্যঙ্গ নাটকাদির মধ্যে প্রসারিত । নতুন পদ্ধতির পাঁচালীতে বহুক্ষেত্রে সমাজসচেতনতার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট । স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীন ভাবধারা রসে পুষ্ট পাঁচালীকারগণ ও তার শ্রোতৃমন্ডলী — মুখ্যত রক্ষণশীল । তবু বিষয়ের উল্লেখ সরাসরি করা হয়েছে এবং তার সম্বন্ধে মতামত দেওয়া-ও হয়েছে । নানা পালার মধ্যে দাশুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কৌলিন্য প্রথা, কালো মেয়ের বিবাহ সমস্যা , ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের লোভ ইত্যাদির আলোচনার সঙ্গে বিধবা বিবাহ, কর্তাভজা, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব প্রমুখ বিষয়ে আলাদা পালা রচনা করেছিলেন ।

দাশরথির সমকালে ও পরে বড় পাঁচালীকার নামে যারা পরিচিত ছিলেন — তাদের মধ্যে গঙ্গা নারায়ণ নস্কর, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, ঠাকুর দাস দত্ত, রসিক চন্দ্র রায়, ব্রজ মোহন রায়, মনোমোহন বসু, গঙ্গাচরণ সরকার, কৃষ্ণধন দে, নন্দলাল রায় উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে রসিক চন্দ্র রায় ছিলেন বিশেষ প্রতিভার অধিকারী এবং পাঁচালী ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থ — হরি ভক্তি বিলাস, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর, দশ মহাবিদ্যা সাধনাদি বিচিত্র বিষয়ে অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। দাশরথির থেকে ১৫ বৎসরের কনিষ্ঠ এই বন্ধুটি ১১ খন্ড পাঁচালী রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। পৌরাণিক পালা ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা — ঝড়ের কান্ড, ডেঙ্গু জ্বর, ইত্যাদি বিষয়ে পালা রচনা করেছিলেন। পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় ছিলেন দাশুর চেয়ে ২৫ বছরের কনিষ্ঠ। তিনিও পৌরাণিক পালার সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গল, বাবুদের কীর্তি ইত্যাদি সম সাময়িক পালা রচনা করেছেন। তাঁর অন্যতম গুরুত্ব — তিনি শেষে পাঁচালী রচনার পর যাত্রা পালা রচনা ও দল গঠন করেছিলেন। অবশ্য যাত্রার পালাগুলিও পৌরাণিক বিষয়ে রচিত রামাভিষেক, অভিমন্যু বধ, সাবিত্রী সত্যবান ইত্যাদি।

পাঁচালীর পথ ধরেই উত্তর কালে যাত্রা গানের উদ্ভব হয়েছে বলে মন্মথ মোহন বসু প্রমুখ অনেকে মনে করেন। কিন্তু 'যাত্রা' ও 'নাটক' শব্দগুলি প্রাচীন। জয় নারায়ণ ঘোষাল লিখেছেন —

কালিয় দমন রাস চন্ডী যাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্য যাত্রা রসে ভরপুর ॥

তারো আগে মধ্যযুগে যে যাত্রা ছিল তার কথা বলেছেন বৃন্দাবন দাস — শ্রীচৈতন্য ভাগবতে — (৩।৪।৪৩)

কৃষ্ণ - যাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ সংকীর্তন।
ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোন জন ॥

মহাপ্রভু - ও চন্দ্রশেখরের গৃহে "অংকের বিধানে" যে নৃত্য করেছিলেন। কাচ সজ্জা করে অভিনয় করেছিলেন (শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্য খন্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়) তা-ও যাত্রা গানের-ই অন্যবিধ রূপ মাত্র। নাটক সৃষ্টির মূলে, কেবল ভারতে

নয় সর্বদেশেই — সংলাপ গীতাদি সহ নায়ুক্ত কথা আছে   নাটক সৃষ্টির মূলে পালা - কীর্তন , কথকতা ইত্যাদির মধ্যে-ও এর সূত্র পাওয়া যায় । এর আগে পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় প্রসঙ্গে দেখা গেছে তিনি পাঁচালী পালা রচনা ও গাহনার পরে যাত্রা পালা রচনা ও গাহনা সুরু করেন । বিষয় এক তার প্রকাশ রীতি ও আঙ্গিক আলাদা । এ দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই অনুমিত হয় যে পাঁচালী থেকে যাত্রা একটি সহজ উত্তরণের পথ রেখা । যাহোক এ সম্বন্ধে — অধ্যাপক ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী যে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সূত্র দিয়েছেন সেটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য —" নাট্য শিল্পের উন্মেষ পর্ব সম্পর্কে সেই জন্য অধ্যাপক বসুর সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে । যাত্রার উদ্ভব প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মতবাদ-ই গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করি । তবে নিছক পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব এই মন্তব্য না করিয়া যদি তৎকালীন জনরুচির পরিমণ্ডলটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখি তবে বলিতে হয়, যাত্রা কোন একটি বিশেষ ধারার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে নাই । তৎকালীন জনরুচির পোষকতা করিত কবি গান, পাচালী কীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন সাহিত্য সঙ্গীত ধারা । এই সাহিত্য সঙ্গীত ধারায় সম্মিলিত সৃষ্টি — যাত্রা । আচার্য শ্রী দে-র মন্তব্যটি প্রসঙ্গতও স্মরণযোগ্য — **Jatra, a spices of popular amusement which was** closely attached**to Kavi and Panchali**

(ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীকার ও বাংলা সাহিত্য - ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী)

(১৩)

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরাজী প্রভাব বর্জিত জনসাহিত্যে — বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের পালার পরিবেশনায় বেশ কয়েকটি নতুন ঢং এর উদ্ভব হয়েছিল । সাধারণ লীলা কীর্তন পদ্ধতি তো ছিলই —— তার সঙ্গে কিছু কিছু প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল সঙ্গীত রচনায় বিশেষ করে গাহনায় আঙ্গিকে । এদের মধ্যে তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য —— রূপচাঁদ পক্ষী, মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান আর কৃষ্ণকমল গোস্বামী ।

রূপচাঁদ ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। তাঁর পিতা কলিকাতা বহুবাজার অঞ্চলে থাকতেন এখানেই রূপচাঁদের জন্ম হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর আসল নাম রূপ চাঁদ দাস মহাপাত্র। সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন — রচনাতেও। নারায়ণ মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ ইয়ার গঠিত পক্ষীর দলে তিনি ছিলেন গরুড়। চুটকি গান, রং তামাসার গান রচনা ও গাহনাতেই তার সর্বাধিক খ্যাতি থাকলেও তাঁর মুখ্য রচনা কিন্তু অনবদ্য ভক্তি সঙ্গীত। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —"রূপচাঁদের ২১১ টি গানের মধ্যে অধিকাংশই পাঁচালী গানের ভক্তি সঙ্গীত, আর কিছু দেহতত্ত্ব বিষয়ক গীতি সঙ্গীত। তাঁর কয়েকটি রঙ্গকৌতুকের গান অন্তর্নিহিত হালকা চালের জন্য কলকাতায় সমাজে খুব চলেছিল বটে, কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ গানই ভক্তি রসের" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ খণ্ড)। তাঁর অধিকাংশ ভক্তির গানে ভণিতা থাকত — খগ, দীন খগের, খগপতি ইত্যাদি একটি নমুনা দেওয়া যাক —

সই হের নব জলধর বরণে।
কটিতটে পীতাম্বর কিবা শোভাকর
মনোহর মুরহর বংশীবদনে,
চরণ অরুণ - কর, নখরেতে নিশাকর
মনোহর শোভাকর জানু করিকর জিনে
চূড়াটেরা মনোহর, তাহে বেড়া গুঞ্জহার
পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর সুধাক্ষীর বচনে ॥
শ্রীনন্দের কুমার পুতনা নিধন কর
ননি চোর বৃন্দা বিপিনে
নট শঠ নাগর ব্রজবধূ মন চোর
স্মরশর নয়ন - সন্ধানে।
ভণে দীন খগবর সযতনে ধ্যানে ধর
শ্যামল সুন্দর ধনে।
যাবে যদি ভবপার ভাব ভবকর্ণধার
রে মূঢ় মন আমার হৃদি পদ্মাসনে ॥

মধুকান

মধুকান — মধুসূদন কিন্নর জন্ম গ্রহণ করেন যশোর জিলার বনগ্রাম মহকুমার উলসিয়া গ্রামে ১২২৫ সালে (১৮১৮ – ১৯ খ্রী)। পিতা তিলক চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়েও মধু দারিদ্র্যের জন্য তেমন লেখা পড়া শিখতে পারেন নি। যৌবনে ঢাকায় ওস্তাদ ছোট খাঁ ও বড় খাঁর কাছে এবং যশোরের রাধামোহন বাউলের নিকট সঙ্গীত - শিক্ষা করেন। তিনি ঢপ কীর্তন নামে এক বিশেষ পদ্ধতিতে রচনা ও গাহনা করতেন —"অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে পাঁচালী, বাউল গান, কথকতা, ও নাট গীতির প্রভাবে কীর্তনের এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়। তাকেই ঢপ কীর্তন বলে। ঢপ্ কথাটি হিন্দী ঢব থেকে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়। হিন্দী ঢব্ এর অর্থ ঢং, রীতি, ধরণ," (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত — চতুর্থ খণ্ড — অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।)

ঢপ কীর্তনের চারটি পালা — কলঙ্ক ভঞ্জন, অক্রুর সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস সংগ্রহ করে শ্রী পাঁচকড়ি দে মহাশয় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন ১৩৪৩ সালে। এই সংগ্রহ ছাড়াও মধুর অনেক ছুট গান আছে। ঢপ কীর্তনের গাহনা রীতি সম্বন্ধে পাঁচকড়ি দে মন্তব্য করেছেন —"ঢপ - কীর্তন গায়ককে একাই সর্ব চরিত্রের অভিনয় করিতে হয়।" মধু তাই করতেন। উত্তর কালে অবশ্য তার পরিবর্তন হয়েছিল।

বাঙালীর গান গ্রন্থের সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখেছেন — ''তাহার সঙ্গীতগুলি ভক্তি রস প্রধান। গানের সুর তিনি কাহার অনুকরণ করেন নাই — স্বয়ংই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 'মধু কানের সুর' এখন প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহার অধিকাংশ গীত 'সূদন' ভণিতাযুক্ত। এক সময় কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন — 'মধু তুমি মধু নাম ত্যাগ করে সূদন ভণিতা দাও কেন ? তাহার উত্তরে মধু বলিয়াছিলেন —'মধু পাছে বিষ হয় এই ভয়ে মধু নাম দিতে আমার সাহস হয় না'।' (বাঙ্গালীর গান — পৃ. ৩১২)

মাথুর পালার একটি গানের উদাহরণ দেওয়া যাক —

বৃন্দেকে কৃষ্ণ বাঁশী দিতে চেয়েছেন —

কথা

কৃষ্ণ — ভাল বাঁশী না নও, প্রাণ।

বৃন্দা — না, ঠাকুর আমি তোমার ও প্রাণের পূর্ণ সুর জানি । ও প্রাণে কাজ নাই । প্রাণ নিলেই প্রাণ যাবে । তোমার প্রাণ তোমারি থাক ।

গীত

রাগিণী সিন্ধু । তাল মধ্যমান ঠেকা

প্রাণ দিও না ও আশা ভাল না ।
কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না ।
এক প্রাণ দেও যারে তারে
দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা যে করে
যে তোমারে প্রাণ দিলে তখনি তার প্রাণ নিলে
কেউ নিলে ত সুখে থাকে না
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর রস হরি
জানি তোমার পঞ্চ রসে যে রসে যে রসে হরি
বলি তোমার এ কি লীলে
বলি তোমার প্রাণ কে নিলে
অদিতি কশ্যপ ত্যজিলে
তাই তে তারা প্রাণ ত্যজিলে,
এই কি তোমার লীলার মন্ত্রণা ॥
ত্রেতা যুগে করে লীলে, সিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে পুনঃ জানকী ত্যজিলে,
তারপরে দাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে
বন্দীশালে তারে রাখিলে জানিলে শুনিলে লীলে ।
কেউ ফেরে না প্রাণ যাচিলে
সুদন কয় সকলি বঞ্চনা ॥

শ্রীকৃষ্ণ কমল গোস্বামী

ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক দিয়ে তো বটেই —— ভক্তি সাহিত্যে তথা কৃষ্ণ পালা রচনার মান ও অবদান সম্বন্ধে এবং পাণ্ডিত্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দিক থেকেও শ্রীকৃষ্ণ কমল গোস্বামীর সঙ্গে রূপচাঁদ ও মধুকানের কোন রকম তুলনা করার প্রশ্ন ওঠে না। মহাপ্রভুর পার্শ্বচর কংসারি সেন ও তৎপুত্র সদাশিবের বংশে কৃষ্ণ কমল জন্ম গ্রহণ করেন ১৮১০ মতান্তরে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে। যশোহর জিলা এদের আদি নিবাস — পিতার নাম মুরলীধর মাতা যমুনা দেবী। পিতা মুরলী সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন —— পুত্র কৃষ্ণ কমলকে তিনি নিজেই সংস্কৃতাদি শিক্ষা দেন এবং সঙ্গে করে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। নবদ্বীপেও কিছুকাল সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন কৃষ্ণ কমল। বৈদ্য হয়েও এঁরা বৈষ্ণব সমাজে সম্ভ্রান্ত গোস্বামী পদে স্থিত ছিলেন। পুরাণ পাঠ, কীর্তন, ভাগবত কথকতায় কৃতিত্ব অর্জন করে ছিলেন। বিবাহের পর এক শিষ্যের সঙ্গে ঢাকায় যান। পরে এটি-ই তাঁর নিজ ক্ষেত্র হয়। বড় গোঁসাই নামে খ্যাত ছিলেন। অন্যান্য বৈষ্ণব - গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি বাদে স্বপ্ন বিলাস দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী বিচিত্র বিলাস প্রমুখ কৃষ্ণযাত্রা রচনা ও গাহনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার রচনা আবেগ - বহুল পদ্যে তথা গীতে রচিত। আসলে তা কীর্তনাদেরই এক প্রসারণ। "কৃষ্ণ কমল যাহা কীর্তনে গান করিতেন তাহাই রূপায়িত করিলেন যাত্রায়। তাহার কাব্যে যে রাধাকৃষ্ণ প্রেম কাহিনী রূপায়িত হইয়াছে তাহা প্রাকৃত প্রেমিক প্রেমিকার ভাল বাসার ঘটনা গর্ভ ইতিহাস নহে। মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণীর অলৌকিক দিব্য প্রেমের সঙ্গীতময় রসৈক সর্বস্ব রূপ দান করিয়াছেন কৃষ্ণকমল।" অধ্যাপক ড: বৈদ্যনাথ শীলের উক্ত মন্তব্যটি সারগর্ভ মর্মবাণী (বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—— ড: বৈদ্যনাথ শীল, প্রথম অধ্যায়)।

বিষয় বস্তুর গৌরবে নয় —— আবেগময় সঙ্গীতময় রচনা শৈলীর মধুর ধ্বনিতে — গভীর অকৃত্রিম ভক্তি রসের আন্তরিক নিবেদনে তাঁর পালাগুলি কেবল রসিক ভক্তের মনে নয়, সাধারণ শ্রোতার হৃদয়েও আনন্দময় তরঙ্গ তোলে। কৃষ্ণকমলের শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী।

পালাটি একটু বিশ্লেষণ করলেই — কৃষ্ণ কমলের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য বুঝা যাবে। প্রথমে গৌর চন্দ্রিকা ——

ফণে গোরাচাঁদ হয়ে দিব্যোন্মাদ
উদ্দীপন ভাবে ভেবে কালাচাঁদ
ধরতে যায় করিয়ে দৈন্য।

তারপর প্রস্তাবনা — কৃষ্ণ হীন গোকুল। নাটকের অকুস্থল দুটি — বৃন্দাবন ও মথুরা। বৃন্দাবনের ছয়টি দৃশ্য —— প্রথম নন্দালয়ে যশোদার আকুতি — বাৎসল্য রস। দ্বিতীয়ে ব্রজপথে রাখালগণ — সখ্যভাবে ক্রন্দন। তৃতীয় — শ্রীরাধা সদন। চতুর্থে রাধা কৃষ্ণ সন্ধানে চললেন বনে সখীদের সঙ্গে। পঞ্চমে গেলেন কদম্ব কাননে। রাধিকার মনে হল কানাই লুকিয়ে আছেন। ষষ্ঠে প্রবেশ করেন কুঞ্জকাননে রাধা — কত মিলন - বিরহের স্থল। সেখানে ডেকে না দেখে মূর্ছিতা হয়ে গেলেন তিনি। দশম দশা উপস্থিত। হেন কালে এলেন প্রতি নায়িকা চন্দ্রবলী। তিনি রাধার অবস্থা দেখে চললেন মথুরায় — কৃষ্ণকে নিয়ে আসবেন। তারপর মথুরা। মথুরার দুটি দৃশ্য — প্রথমটি রাজপথ দ্বিতীয়টি অন্তঃপুর। কৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর গানে গানে সংলাপ। রাধার অবস্থা শুনে কৃষ্ণ বললেন চন্দ্রাবলীকে তুমি যাও আমি আসছি। আবার ঘটনাস্থল বৃন্দাবন — নিকুঞ্জকানন। রাধাকৃষ্ণের মিলন।

পদাবলী কীর্তনের বা পৌরাণিক ভাবনা বিয়োগান্ত বা ট্র্যাজেডি থাকে না। জীবনে আত্যন্তিক বিরহের স্থান নাই আছে সাময়িক বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের।

আচার্য ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের দুটি মন্তব্য উদ্ধার করে —— কৃষ্ণকমল প্রসঙ্গটি শেষ করা যাক।

(ক) তাঁহার কৃষ্ণকমলের সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক রাই উন্মাদিনীতে (দিব্যোন্মাদ) চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের সারকথা প্রদত্ত হইয়াছে। রাধার প্রতি যে সকল ভাব আরোপ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিটি-ই চৈতন্য জীবনের কোন না কোন অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। বাস্তবের ভিত্তিতে এই স্বপ্নালোকের সৌধ নির্মিত হইয়াছে।

(খ) "মণিমালার মধ্যে যেমন মধ্যমণি কৌস্তুভ, কৃষ্ণকমলের কাব্যগুলির মধ্যে 'রাই উন্মাদিনী' সেইরূপ । স্বপ্নবিলাসে যে ভাবের উদয় রাই উন্মাদিণীতে তাহার পরিণতি । স্বপ্ন বিলাসের ভাবগুলি কতকটা অসম্বদ্ধ । খুব জমাট বাঁধে নাই, রাই উন্মাদিণীর অনেক কথাই উহাতে আছে , কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে যে নিপুণতা রচনা কৌশল ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তাহা স্বপ্ন বিলাসে নাই ।'' (কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী — কাব্য সমালোচনা — রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন ডি.লিট)

(ট)

সমকালের ভক্তি সাহিত্যের প্রাণ মাতানো বলিষ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল কৃষ্ণযাত্রার মধ্যেও তবে অন্য আঙ্গিকে গোবিন্দ অধিকারী , ব্রজ মোহন রায় প্রমুখ যাত্রাকারের রচনায় । অবশ্য একালের কৃষ্ণযাত্রার মূল ধারার উৎস মূলে ছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী । কৃষ্ণ কমল গোটা পালাই পদ্য ও গীতের আধারে রচনা করেছেন, কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী গদ্য কথা বক্তৃতা, এবং সংলাপে গদ্য রীতির প্রচলন করেন । কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কালীয় দমন কলঙ্ক ভঞ্জন, মুক্তা লতা বসন প্রমুখ ১৬।১৭ খানি পালা রচনা ও অভিনয় করেছেন তিনি । নিমাই সন্ন্যাসও রচনা করেছিলেন । তিনি নিজে পালাতে অংশ গ্রহণ করতেন মুখ্যত: বৃন্দেদূতীর ভূমিকাতে । তাঁর অভিনয়কলা কিংবদন্তীর মতো হয়ে আছে । বাঙ্গালীর গানের সম্পাদক লিখেছেন "তিনি তাঁহার কৃষ্ণ যাত্রায় নিজে দূতী সাজিতেন । তাঁহার দূতী গিরি দেখিবার জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে আসিত । দূতী সাজিয়া যখন তিনি আসরে নামিতেন তখন চারিদিকে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত, আনন্দে শ্রোতৃবৃন্দ হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন" (বাঙ্গালীর গান — পৃ. ৩২৯) । এই বার যাত্রা পালাতে সংলাপের মধ্যে মুখ্যত: শ্লেষাত্মক উক্তি ও ব্যাঙ্গ স্তুতি — শ্রোতৃগণের অন্তর আবেগে উদ্বেল করত । গোবিন্দ অধিকারী রচিত 'শুক - শারীর ' দ্বন্দ্বটি উনিশ শতকে যাত্রা সাহিত্যের সীমা উত্তীর্ণ করে এখনো ভক্ত রসিক হৃদয়ে কৌতুক - সুগন্ধি বিতরণ করে ।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের রাই আমাদের
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের ।।

শুক বলে — আমার কৃষ্ণ মদন মোহন ।

শারী বলে – আমার রাধা বামে যতক্ষণ
নইলে শুধুই মদন ।
শুক বলে – আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল
শারী বলে - আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন ?
শুক বলে - আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা
শারী বলে - আমার রাধার নামটি তাতে লেখা –
ঐ যে যায় গো দেখা ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে ।
শারী বলে - আমার রাধার চরণ পাবে বলে
চূড়া তাই-তে হেলে ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ যশোদা জীবন
শারী বলে - আমার রাধা জীবনের জীবন
নইলে শূন্য জীবন ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি
শারী বলে - আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী
সে তোমার কৃষ্ণ জানে ॥
শুক বলে – আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান ।
শারী বলে – সত্য বটে বলে রাধার নাম
নৈলে মিছে সে গান ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু
শারী বলে - আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু
নৈলে কে কার গুরু ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী
শারী বলে - আমার রাধা প্রেমের লহরী
প্রেমের ঢেউ কিশোরী ॥

শুক বলে - আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা
শারী বলে - আমার রাধা করে আনা গোনা
নৈলে যেত জানা ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগতের কালো ।
শারী বলে - আমার রাধার রূপে জগৎ আলো
নৈলে আঁধার কালো ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণের শ্রী রাধিকা দাসী
শারী বলে - সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী
নৈলে হত কাশী বাসী ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ
শারী বলে - আমার রাধা স্থগিত পবন
সে যে স্থির পবন ॥
শুক বলে - আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ
শুরী বলে - আমার রাধা জীবন করে দান
থাকে কি আপনি প্রাণ ॥
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল —
রাধা কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল ।
(বলে বৃন্দাবন চল ।) ॥

গোবিন্দ অধিকারীর শিষ্য নীলকন্ঠ মুখোপাধ্যায়-ও যাত্রাদল গঠন, পালা রচনা ও গানো করেছেন । সুকন্ঠ নীলকন্ঠের গানের খ্যাতি ছিল । তিনি-ও সখী র ভূমিকা করে গেছেন । কৃষ্ণকালী শিব সব দেব দেবীকে নিয়েই নীলকন্ঠ সঙ্গীত রচনা করতেন । নীলকন্ঠ পদাবলী গ্রন্থে সেগুলি সংকলিত । যাত্রা পালা ছাড়া-ও ছুট সঙ্গীত রচনার প্রথা ছিল । এ সময়ের গীতকার বা পালাকারদের মধ্যে একটি বিরল স্তব — গঙ্গাস্তোত্র গীতি রচনা করেছিলেন নীলকন্ঠ । দশটি স্তবকে রচিত স্তবগীতিটির কেবল প্রথম অংশ উদ্ধার করা গেল ।

সুরশৈবলিনী জগৎ জননী
শংকর মৌলী বিবাসিনী গঙ্গে
মম পাপাটবী ছেদসা জাহ্নবী
কৃপাণ স্বরূপ কৃপা - অপাঙ্গে ॥
গোলোক ত্রিলোক ত্রিধারা
ত্রিলোক আরাধ্যা সর্ব সারাৎসারা
সর্ব তীর্থময়ী সর্ব পাপ হরা
ভবদারা ভব কলুষ ভঙ্গে ।
বিষ্ণু পদোদ্ভবা সকলেতে গায়
কিন্তু কিমাশ্চর্য কার্য দেখা যায়,
তোমার জীবনে জীবন যদি যায়
বিষ্ণুলোক পায় পাপাদে ॥
কে জানে মা গঙ্গে তব গুণ গরিমা
বিধি বিষ্ণু শিব দিতে নারে সীমা
আমি জ্ঞানহীন কেমনে কহি মা
অসীম মহিমা তব দুবাঙ্গে ।। (বাঙালীর গান — পৃ. ৭৫২)

দাশরথির প্রায় সমকালবর্তী পাঁচালীকার ব্রজমোহন রায় — পাঁচালীর দলকে যাত্রার দলে রূপান্তরিত করেন । তিনি রামাভিষেক, অভিমন্যু বধ , কংস বধ ইত্যাদি ১টি যাত্রার পালা রচনা ও গাহনা করেছিলেন । আঙ্গিক ছিল গোবিন্দ অধিকারীর মতো তবে বক্তৃতা - সংলাপের গদ্য কিছুটা দীর্ঘ ও ভাষা সংস্কৃতগন্ধী ছিল ।

উনিশ শতকে ভক্তিরস প্রধান ও প্রচার ধর্মী যাত্রা পালাকারদের মধ্যে অন্যতম খ্যাতিমান ছিলেন মতিলাল রায় । শুধু কৃষ্ণ কথা নয় রামায়ণ , মহাভারত, পুরাণাদি থেকে বিষয় সংগ্রহ করে তিনি — অনেকগুলি পালা রচনা করেন ।
ড: অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মতিলাল সম্বন্ধে লিখেছেন ——" যাত্রাকে তিনি লোকশিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন , কাজেই এর মধ্যে চরিত্র ও সমাজ কল্যাণকর

পৌরাণিক নীতি ও আদর্শের জয় ধ্বনি করা হয়েছে । * * * *
পুরাতণ যাত্রা গানের প্রচলিত আদর্শ তিনি অনেকাংশে পরিত্যাগ করেন । যাত্রার পালাকে অংকে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে এবং দীর্ঘ সংলাপ (বক্তৃতা ও কথকতার মতো অতি দীর্ঘ্য ব্যবহার করে তিনি যাত্রা গানকে যাত্রাভিনয়ে রূপান্তরিত করেন । নীলকণ্ঠ পর্যন্ত যাত্রার যে পুরাতণ রীতি ছিল তা তিনি ত্যাগ করে যাত্রাকে পুরাপুরি নাটকের রূপ দেন ।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত – ৪র্থ খণ্ড)

(চ)

যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে - সিপাহী বিদ্রোহের দু বৎসর পর এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের তিন বৎসর পূর্বে । ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ ছিল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের-ও প্রকাশ কাল । বস্তুত: এই সময় থেকে-ই যথার্থ ভাবে আধুনিক যুগের আরম্ভ এবং ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত সমাপ্তি কাল । ভারত চন্দ্রের মৃত্যু থেকে ঈশ্বর চন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোটামুটি শত বৎসর কালকে বলা যায় মধ্য যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের অভ্যুদয় কাল । একদিক থেকে এই শত বৎসরকে যুগসন্ধির কাল বললে-ও খুব একটা ভুল হয় না । উনিশ শতকের প্রারম্ভ থেকে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছিল — তাতে দ্বিধা বিভক্ত হয়েছিল বাঙালীর শিল্প ভাবনা ততোধিক সাহিত্য শিল্প - ভাবনা । একটি পুরাণো দিক — ইংরাজী প্রভাব বর্জিত ধারা, অপরটি নূতন দিক ইংরাজী প্রভাব পুষ্ট ধারা । যুগসন্ধির প্রথমার্ধটিতে ইংরাজী প্রভাব বর্জিত বাংলা সাহিত্য ধারায় — কবি, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী - কৃষ্ণযাত্রা প্রমুখ শাখার নানা বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের তথা ভালভাবে টিঁকে থাকার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস । সেটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রস্তুত অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে । যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত — দুটি ধারার মধ্যে অবাধে বিচরণ করেছেন । আধুনিকতাকে — তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে আহ্বান করেছেন এবং প্রাচীন ধারার গঙ্গাযাত্রার কীর্তনে-ও সামিল হয়েছে । তিনি কবি-পাঁচালী - টপ্পা গীতের কেবল সংগ্রাহক ও ঐতিহাসিক ছিলেন না, কবির আসরে নিজে-ও গীত রচনা

করেছেন। তাঁর রচনা রীতির মধ্যে একটি সরল স্নিগ্ধ সাহিত্যরস সমৃদ্ধ ঔজ্জ্বল্য ছিল — যা একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব। বোধ হয় এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে শেষ খাঁটি বাঙালী কবির শিরোপা দিয়েছেন। "এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখেন নাই — আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তার কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।" (ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব — শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা।)

গুপ্ত কবির শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে এই দুই ধারারই প্রতিনিধি ছিলেন যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন — বঙ্কিম-দীনবন্ধু রঙ্গলালরা একদিকে — অপর দিকে মনোমোহন বসু প্রমুখ, মনোমোহন — হাফ আখড়াই, কবি, গীতাভিনয়, পাঁচালী প্রমুখ — ইংরাজী প্রভাব বর্জিত ধারায় বহু পালা গান রচনা করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন — "কবি গান ও পাঁচালী রচনায়, সাময়িক পত্র পাঠ চালনায় এবং উপদেশাত্মক বক্তৃতায় মনোমোহন প্রাচীন পন্থী সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। মনোমোহনও ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন) তাঁর রচিত ঈশ্বর বিষয়ক একটি ভক্তি সঙ্গীত উল্লেখ করা যাক —

তুংহি আদি কারণ সর্বসাক্ষী সনাতন, রূপহীন
নিত্য নিরাময় জগজ্জীবন নিরঞ্জন ॥
সদা শিব সদানন্দ রূপ মহাব্যাম বক্ষ অনুপ,
সৃজন পালন লয় ত্রিগুণ - ত্রিনয়ন,
ব্যাপ্তি নামে ভুজ — অনন্ত সুশোভন ॥
সর্বজীবে সম দরশন পাপি হৃদয় তাপ হরণ।
শান্তি শিরসি - জটাশিহত করুণা গঙ্গা ধারণ।
জপ তপ ধ্যান জ্ঞানাতীত গুপ্ত ভাবফণি বেষ্টিত
মহিমা বিষাণ বিশ্বে বাদিত, নিনাদিত
নাস্তিক্য মোহ মরণ বিনাশন ॥
(মনোমোহন গীতাবলী — গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

তখন যাত্রা গানের আর একটা যাত্রার বা অভিধা পেয়েছে — নাম হয়েছে গীতাভিনয়, দীর্ঘ বক্তৃতা ও জুড়ির গান দিয়ে পরিবেশ - স্থান কালাদির সংকেত হোতো। আচার্য সুকুমার লিখেছেন —— "গীতাভিনয় অর্থাৎ আধুনিক যাত্রার মূলে পাঁচালীর প্রভাব-ও কম নয়। এই প্রভাব আছে আখ্যান বস্তুতে আর গানের সুরে। তাছাড়া দীর্ঘ বক্তৃতায়, কথকতায় প্রভাব রহিয়াছে। * * * মনোমোহন বসুর নাটকগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস - দ্বিতীয় খণ্ড - সুকুমার সেন)

মনোমোহন রচিত গীতাভিনয়ের পালাগুলির মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই পুরাণের যাত্রা - পাঁচালীর কথাকতার ভক্তি-ভাবের প্রাধান্য ছিল। হরিশ্চন্দ্র, পার্থ পরাজয়, যদুবংশ ধ্বংস, রামাভিষেক সতী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

(চ)

উনিশ শতকের ইংরাজী প্রভাব পুষ্ট শাখায় কাব্যে ভক্তি-ভাবের আবেদন শীর্ণতর হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য [illegible] লিখলেন ঐতিহাসিক কাব্য। তারপর মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভেরী বাজিয়ে আবির্ভূত হলেন নব্য বঙ্গ সাহিত্যের অঙ্গনে। কী নাটক কী মহাকাব্য — বিষয়গুলি তিনি পুরাণ ভাণ্ডার হতে আহরণ করলে-ও নতুন মানবতা ও প্রেমকে, বুদ্ধির দিক দিয়ে গ্রহণ করলেন। এমন কি ব্রজাঙ্গনাতে ব্রজ বালাদের আবেগ সুন্দর ছন্দের আঙ্গিকে — কেমন যেন মেকী ও কৃত্রিম বলে বোধ হয়। হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্র দু'জনই মহাকাব্য রচনা করেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রকে মূল করে নবীন চন্দ্র রৈবতক - কুরুক্ষেত্র - প্রভাস লিখলেন — কিন্তু হৃদয়াবেগের সেই সহজাত তীব্রতা রইল না। বিহারী লাল তাঁর কাব্যের সুরে রোমান্টিক চেতনার দোতরায় সৌন্দর্য ও প্রেমের তার বাঁধলেন। স্বাভাবতই প্রকৃতি, প্রেম - নারী মুখ্য স্থান নিল। মূলতঃ ইংরেজ কবিদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে। অর্থাৎ উনিশ শতকের ইংরাজী প্রভাব পুষ্ট কাব্য শাখায়

ভক্তির - কুঁড়ি — হৃদয়াবেগের তাপে অংকুর ফুটে উঠল না।

পক্ষান্তরে নাটকের শাখায় ভক্তি আবেগ খানিকটা স্থান পেল। দীনবন্ধু মিত্র সামাজিক বিষয়গুলিকেই বিষয় করেছিলেন। নব উদ্বেলিত জাতীয় চেতনার ছোঁয়ায় তাতে অভিনব আকারে অবয়ব ফুটে উঠল। সামাজিক সমস্যা ও বিষয় নিয়ে লিখলেন রাম নারায়ণ তর্করত্ন। প্রহসন কয়েকখানি ব্যঙ্গ কৌতুকও হ'ল রচিত। উনবিংশ শতকের অন্ত্যপাদে মুখ্যত: রামকৃষ্ণ রায় ও গিরিশ চন্দ্রের রচনাতে পৌরাণিক বিষয়ের উপর নতুন জোর দেওয়া হয়েছিল। একটা নতুন আবেগের সঞ্চার করেছিল। নতুন ছন্দ- ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দে — যাকে কেউ কেউ পরে গৈরিশ ছন্দ বলে অভিহিত করেছেন — সংলাপ রচনা করে তিনি নতুন ভাবাবেগ ও ভক্তি প্লাবনের সৃষ্টি করেন -- যার তরঙ্গ বিংশ শতকে প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলার নাট্যমঞ্চের অন্যতম মুখ্য সুর ছিল। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে তিনি রামের বনবাস, সীতা হরণ, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, লক্ষ্মণ- বর্জন, --- প্রমুখ নাটক এবং মহাভারত ও পুরাণ থেকে বিষয় আহরণ করে অভিমন্যু বধ, বৃষকেতু, নলদময়ন্তী, দক্ষযজ্ঞ, জনা, পান্ডব গৌরব ইত্যাদি রচনা করে ছিলেন। মহাপুরুষদের চরিত্র নিয়ে লিখিত নাট্যাবলী চৈতন্য লীলা, বুদ্ধদেব চরিত, রূপ সনাতন, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তিরস সঞ্চারের ও প্রচারের মূল আধার হয়েছিলেন। উনবিংশ শতকের অন্ত্যপাদে রাজকৃষ্ণ রায়ও রামের বনবাস, যদু বংশ ধ্বংস অনলে বিজয়ী (সীতার অগ্নি পরীক্ষা), তরণী সেন বধ, তারকসংহার, গঙ্গা মহিমা, বামন ভিক্ষা, ভীষ্মের শরশয্যা প্রমুখ বহু পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। প্রসঙ্গত: স্মরণযোগ্য যে এই রাজকৃষ্ণ রায় রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যোনুবাদ করেছিলেন — তা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে

কাব্য - কবিতা ও নাট্য সাহিত্যের মধ্যে যে ভক্তি ভাবের কার্পণ্য দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতকে — গিরিশচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণের ব্যতিক্রম নাটকাদি বাদ দিলে — এমন একটা ধারণা হওয়া অসম্ভব কল্পনা নয় বলে ধরা যায় কি ? তাহলে বাংলা সাহিত্যে তথা বাঙালী জীবনে ভক্তির আবেগ - স্রোত কি শুকিয়ে গিয়েছিল বা অন্য

ধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে পথান্তরে প্রবাহিত হয়েছিল কিংবা ফল্গুর মতো সাহিত্য জীবনের গভীরে প্রবাহিত ছিল ?

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে সাধ্য মতো আলোচনা করব ।